গল্প: শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রচোর ■ ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

বাড়ির বাইরে দেখলাম বাড়িওয়ালা অধ্যাপক সোম বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে। তাঁরও সস্ত্রীক নিমন্ত্রন ছিল জানতাম।
দাঁড়িয়ে যে! যাবেন না?
যাব। কিন্তু গিন্নীর এখনও প্রসাধন শেষ হয়নি। আপনারা এগোন।
অধ্যাপক সোমের জীবনে তার স্ত্রী একটি কাঁটা - দাম্পত্যে জীবনে তিনি সুখী হতে পারেন নি।
শালটা ভাল করে জড়িয়ে নাও।
আমরা রিকশায় চললাম। মহীধর চৌধুরী আমাদের নিমন্ত্রন করেছেন। তিনি ধনী, বয়সে প্রবীন হলেও নানান
পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাসভবনটি ভারী মনোরম।
মহীধর বাবু সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।
আসুন, আসুন। আপনাদের কথাই ভাবছিলাম।
মহীধর বাবুর জীবনের একমাত্র সম্বল এবং তার উত্তরাধিকারিনী তার মেয়ে - - রজনী।
আসুন, আসুন। বাবার মুখে আপনাদের কথা খুব শুনেছি।
রজনী আর সত্যবতী গল্প জুড়ে দিল।
আমাদের সঙ্গে আর একজনের আলাপ হল।
আমি নকুলেশ সরকার। বাজারে আমার একটা ফটোগ্রাফির দোকান আছে।
তাই নাকি? বাঃ। যাব আপনার দোকানে।
ডাক্তার ঘটক আগেই উপস্থিত হয়েছিলেন। মহীধর বাবু তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন
ওহে ঘোটক, তুমি দেখছি নামেও ঘোটক, কাজেও ঘোটক!
তুমি এতদিনেও ব্যোমকেশ বাবুকে চাঙ্গা করে তুলতে পারলে না! তুমি একেবারে ঘোড়ার ডাক্তার। হা - হা - হা - হা -
ঘোড়ার ডাক্তার না হয়ে উপায় আছে? একে অশ্বিনী তায় ঘোটক।
তবে উনি ডাক্তার হিসাবে একদম একনম্বর, এটা একবাক্যে সবাই মানে। নইলে দুতিন বছরে এত পসার হয়?
একে একে অতিথিরা সবাই এসে পড়তে লাগলেন। উমানাথ ঘোষ। ডেপুটি, সরকারী মালখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। খুব গম্ভীর মানুষ।
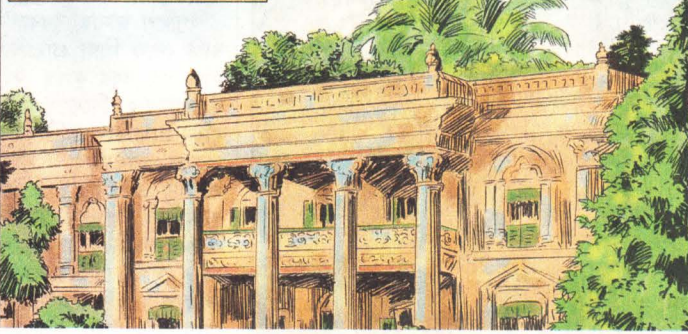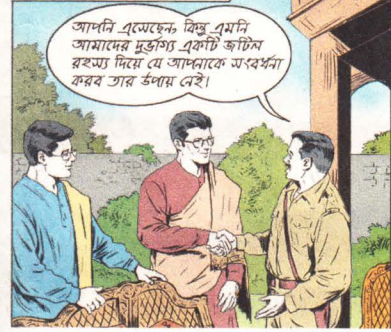
এরপর এলেন পুলিসের ডি এস পি পুরন্দর পান্ডে। বাঙালি নন, কিন্তু পরিষ্কার বাংলা বলেন।
আপনি এসেছেন, কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য একটি জটিল রহস্য দিয়ে যে আপনাকে সংবর্ধনা করব তার উপায় নেই।

আমাদের এলাকায় রহস্য জিনিসটার ভারী অভাব। সব খোলাখুলি। চুরি বাটপাড়ি যে হয়না তা নয়, কিন্তু তাতে বুদ্ধি খেলাবার অবকাশ নেই।
সেটা আমার পক্ষে ভালই। জটিল রহস্য এবং আরও লোভনীয় বস্তু থেকে আমি উপস্থিত বঞ্চিত। ডাক্তারের বারণ।
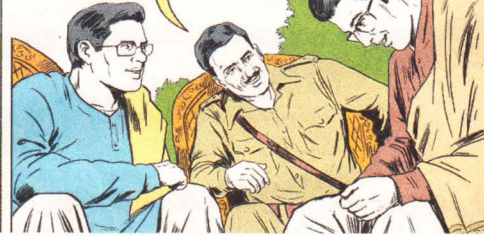
এইসময় আর একজন অতিথি দেখা দিলেন। স্থানীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা।
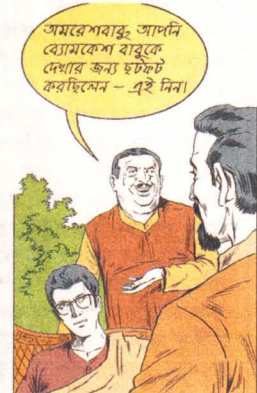
অমরেশবাবু, আপনি ব্যোমকেশ বাবুকে দেখার জন্য ছটফট করছিলেন – এই নিন।

নমস্কার, নমস্কার! কীর্তিমান মানুষকে দেখার ইচ্ছা কার না হয় বলুন? এনারাও কম ছটফট করছিলেন না, শুধু আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন?
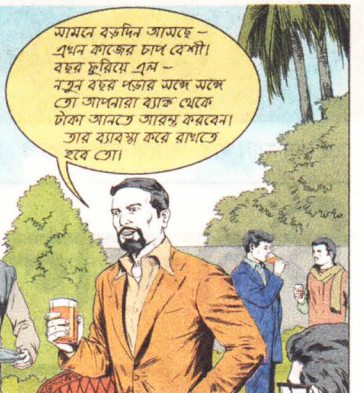
কিন্তু আজ আসতে এত দেরি করলেন কেন? ব্যাঙ্ক তো সেই সাড়ে তিনটের সময় বন্ধ হয়েছে।
সামনে বড়দিন আসছে – এখন কাজের চাপ বেশী। বছর ফুরিয়ে এল – নতুন বছর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তো আপনারা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনতে আরম্ভ করবেন। তার ব্যাবস্থা করে রাখতে হবে তো।

এইসময় কয়েকজন চাকর খাবারের ট্রে এনে সাজাতে আরম্ভ করল।

রজনী উঠে এসে তদারক করতে লাগল।
ব্যোমকেশ বাবু, একটু জলযোগ।

সত্যবতী দূর থেকে একদৃষ্টে ব্যোমকেশের দিকে চেয়ে ছিল। ব্যোমকেশ আড়চোখে সেদিকে তাকাল।
ইয়ে – আমাকে মাফ করতে হবে। এসব আমার চলবে না।

সে কী কথা! একেবারেই চলবে না? একটু কিছু – ওহে ডাক্তার, তোমার রোগীর কি কিছুই খাবার হুকুম নেই?

না খেলেই ভাল।

শুনলেন তো! আমাকে শুধু এক পেয়ালা চা দিন। ভাববেন না, আবার আমরা আসব, আজকের আসাটা মুখবন্ধ মাত্র।

আমার বাড়ীতে রোজ সন্ধ্যেবেলা কেউ না কেউ পায়ের ধুলো দেন। আপনারাও যদি মাঝে মাঝে আসেন খুব জমবে।

অধ্যাপক সোম এইবার সস্ত্রীক এসে পৌঁছলেন। তার স্ত্রী মালতী দেবী, বয়েসে স্বামীর সমকক্ষ।
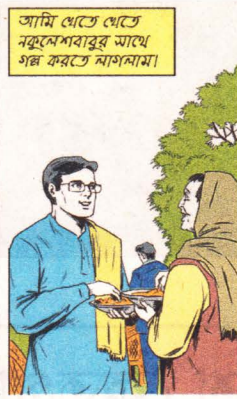
আমি খেতে খেতে নকুলেশবাবুর সাথে গল্প করতে লাগলাম।

ব্যোমকেশ শহীদের মত ভাব নিয়ে চা খাচ্ছিল।
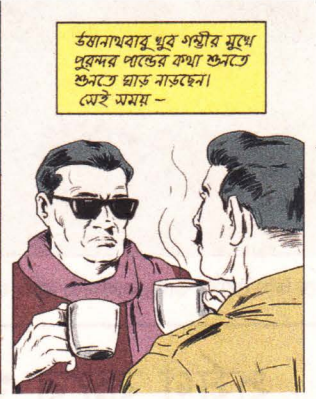
উমানাথবাবু খুব গম্ভীর মুখে পুরন্দর পাণ্ডের কথা শুনতে শুনতে ঘাড় নাড়ছেন।
সেই সময় –

কাল রাতে আমার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল।
কিছু চুরি গেছে না কি?
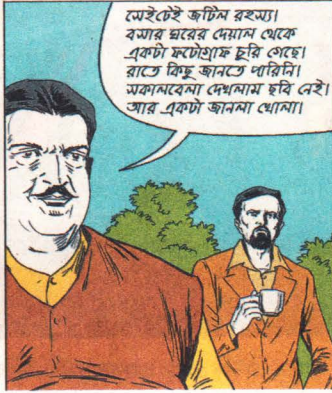
সেইটেই জটিল রহস্য। বসার ঘরের দেয়াল থেকে একটা ফটোগ্রাফ চুরি গেছে। রাতে কিছু জানতে পারিনি। সকালবেলা দেখলাম ছবি নেই। আর একটা জানলা খোলা।

ছবি? কোন ছবি?
একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ। মাস খানেক আগে আমরা পিকনিকে গিয়েছিলাম। সেই সময় নকুলেশবাবু ছবিটা তুলেছিলেন।

হু। আর কিছু চুরি করেনি? ঘরে দামী জিনিস কিছু ছিল না?

কয়েকটা রূপোর ফুলদানি ছিল, তা ছাড়া পাশের ঘরে অনেক রূপোর বাসন ছিল।
চোর এসব কিছুই নেয়নি।

চোর এসব কিছু না নিয়ে স্রেফ একটা ফটো নিয়ে পালাল। বলুন দেখি জটিল রহস্য কি না?
আপনি চাইলে জটিল মনে করতে পারেন। আমার তো মনে হয় কোনও জংলী সাঁওতাল জানলা দিয়ে ঢুকেছিল, তারপর ছবির ফ্রেমের লোভে ছবিটা নিয়ে ভেগেছে।

ব্যোমকেশবাবু, আপনার কী মনে হয়?
মিস্টার পান্ডে ঠিকই ধরেছেন মনে হয়। নকুলেশবাবু – আপনি ছবি তুলেছিলেন?

হ্যাঁ। ছবিখানা ভাল হয়েছিল। তিন কপি ছেপেছিলাম। মহীধরবাবু এক কপি নেন।
আমিও একখানা কিনেছিলাম।

আপনার ছবিখানা আছে তো?
কি জানি। অ্যালবামে রেখেছিলাম। তারপর আর দেখিনি। আছে নিশ্চয়।

আর তৃতীয় ছবিটি কে নিয়েছিলেন নকুলেশবাবু?
প্রফেসর সোম।

আপনার ছবিটা নিশ্চই আছে?
অ্যাঁ! – তা – বোধহয় – ঠিক বলতে পারি না –

তা গিয়ে থাকে যাক গে, আর একখানা নেবেন। নকুলেশবাবু, আমারও কিন্তু একখানা চাই। আমিও ওখানে ছিলাম।
ও ছবিটা আর পাওয়া যাবে না। নেগেটিভ খুঁজে পাচ্ছি না।

সেকি? কোথায় গেল নেগেটিভ?
আমার স্টুডিওতে অন্যান্য নেগেটিভের সঙ্গে ছিল। আমি দিন দুয়েকের জন্য কলকাতায় গিয়েছিলাম। স্টুডিও বন্ধ ছিল। ফিরে এসে আর সেটা পাচ্ছি না।

ভাল করে খুঁজে দেখবেন। নিশ্চই কোথাও আছে। যাবে কোথায়?

সন্ধ্যা নামছিল। আমরা উঠি উঠি করছিলাম। এইসময় একজন লোক মহীধরবাবুর কাছে হাজির হল।

আবার কি চাই বাপু? এই তো পরশু তোমাকে টাকা দিয়েছি।
আজ্ঞে, আমি টাকা চাই না। আপনার একটা ছবি এঁকেছি, তাই দেখাতে এনেছিলাম।

আমার ছবি!
হ্যাঁ, এই যে দেখুন।

লোকটি হাতের পাকানো কাগজ খুলে মহীধরবাবুর সামনে ধরল।

শুনতে পেয়ে সবাই মহীধরবাবুর কাছে এসে জড়ো হল।
বাহ – কি সুন্দর ছবি!
তুমি তো খাসা ছবি আঁকতে পার! কি নাম তোমার?

আজ্ঞে, আমার নাম ফাল্গুনী পাল।
ছবিটা হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। সকলের মুখে প্রশংসা।

মহীধরবাবু খুশি হয়ে টাকা বার করলেন।
বেশ, বেশ। ছবিখানা আমি নিলাম। এই নাও পুরস্কার।

ফালগুনী কাঁকড়ার মত হাত বাড়িয়ে টাকা পকেটে ভরল।
তুমি ওনার ছবি আঁকলে কি করে? ফটো থেকে?
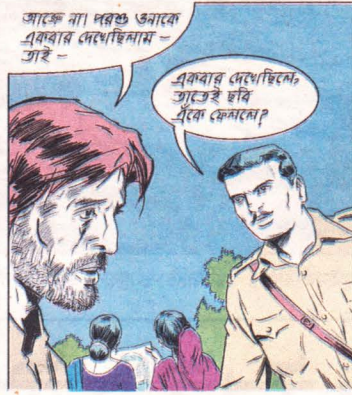
আজ্ঞে না। পরশু ওনাকে একবার দেখেছিলাম – তাই –
একবার দেখেছিলে, তাতেই ছবি এঁকে ফেললে?

আজ্ঞে, আমি পারি। আপনি হুকুম দিলে আপনার ছবিও আঁকতে পারি।

আচ্ছা বেশ। তুমি যদি আমার ছবি এঁকে আনতে পার, আমিও বখশিশ দেব।

ফালগুনী সবাইকে নমস্কার করে চলে গেল। ব্যোমকেশ আর পান্ডেজী চোখের ইঙ্গিতে কিছু বললেন।
দেখা যাক। আমি ওনাদের পিকনিক দলে ছিলাম না।

মহীধরবাবুর মোটর আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিল। সোম দম্পতি ও আমাদের সঙ্গেই ফিরলেন।

রাত আটটা নাগাদ বসবার ঘরে তিনজনে আজকের নিমন্ত্রণের কথাই আলোচনা করছিলাম।

ব্যোমকেশ কেদারায় বসে বলবর্ধক ডাক্তারি মদ্য পান করছিল। সত্যবতী বসে গল্প করছিল।
আমি পকেট থেকে সিগারেট বার করেও আবার রেখে দিচ্ছিলাম।

আমরা শিল্প সাহিত্যের কত আদর করি – ফালগুনী পাল তার উদাহরণ। লোকটা সত্যিকার গুণী, অথচ পেটের দায়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে।
পেটের দায়ে ভিক্ষে করছে তুমি জানলে কি করে?

ওর চেহারা আর কাপড় চোপড় দেখে পেটের অবস্থা আন্দাজ করা শক্ত নয়।

সেই জন্যই তুমি ভুল আন্দাজ করেছ। তুমি সাহিত্যিক, শিল্পীর প্রতি তোমার সহানুভূতি স্বাভাবিক।

কিন্তু ফালগুনী পালের দুর্গতির কারণ অন্নাভাব নয়। আসলে খাদ্যের চেয়ে পানীয়ের প্রতি তার টান বেশি।

তার মানে মাতাল?
তুমি কী করে বুঝলে?
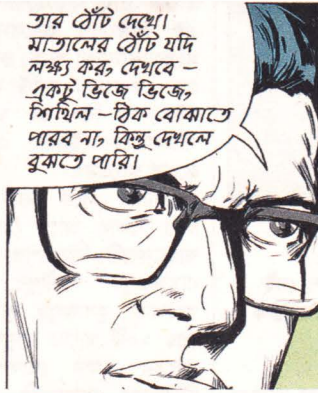
তার ঠোঁট দেখে। মাতালের ঠোঁট যদি লক্ষ্য কর, দেখবে — একটু ভিজে ভিজে, শিথিল — ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু দেখলে বুঝতে পারি।

দ্বিতীয়ত ফাল্গুনী যদি ক্ষুধার্ত হতো তাহলে টেবিলের খাবারগুলোর দিকে তার চোখ যেত, টেবিলে তখনও প্রচুর খাবার ছিল। সেদিকে ও ফিরেও তাকায়নি। তাছাড়া আমার পাশ দিয়ে যখন গেল তখন গায়ে মদের গন্ধ পেলাম। স্পষ্ট নয়, তবু মদের গন্ধ।

যাক গে। মাতালের কথা শুনতে ভাল লাগে না। কিন্তু ছবি চুরির ব্যাপারটা কি গো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না। মিছিমিছি ছবি চুরি করবে কেন?

হয়তো পান্ডে সাহেব ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু — যদি তা না হয় তাহলে ভাববার কথা। পিকনিকে গ্রুপ ছবি তোলা হয়েছিল। আজ যারা চায়ের পার্টি তে এসেছিলেন, তারা সকলেই পিকনিকে ছিলেন — পান্ডে সাহেব ছাড়া।

ছবির তিনটে কপি ছাপা হয়েছিল। তার মধ্যে একটা চুরি গেছে, বাকি দুটো আছে কিনা জানা যায়নি। নেগেটিভটাও পাওয়া যাচ্ছে না।

আমাদের বাড়ীওয়ালা ছবির কথায় এমন ঘাবড়ে গেলেন কেন বোঝা গেল না।
কেউ যদি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ছবিটা সরিয়ে থাকে তবে সে উদ্দেশ্য টা কী হতে পারে?

উদ্দেশ্য কি একটা অজিত? কে কোন মতলবে ফিরছে তা কি এত সহজে ধরা যায়? গহনা কর্মনো গতিঃ।

সেদিন একটা মার্কিন পত্রিকায় দেখছিলাম, ওদের চিড়িয়াখানাতে এক বানর- দম্পতি আছে। ছেলে বাঁদরটা এমনি হিংসুটে, কোনও পুরুষ — দর্শক খাঁচার কাছে এলেই বৌকে টেনে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে।

হি হি হি— যাহ্ — তোমার যত আষাঢ়ে গল্প। বাঁদরের কখনও এত বুদ্ধি হয়?

এটা বুদ্ধি নয়, এটাকে বলে যৌন ঈর্ষা। মানুষের মধ্যেও আছে। ছেলেদের তো আছেই, মেয়েদের আরও বেশি করে আছে।

আমি যদি মহীধরবাবুর মেয়ে রজনীর সঙ্গে বেশি মাখামাখি করি, তোমার ভাল লাগবে না।
সত্যবতী চুপ করে গেল।
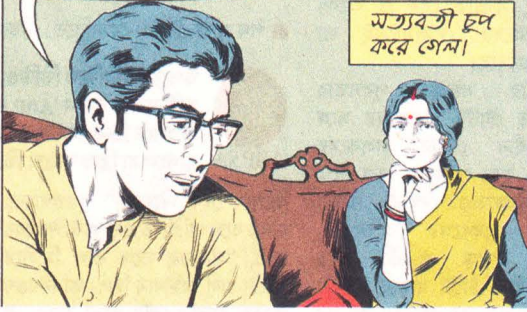
কিন্তু এই ঈর্ষার সঙ্গে ছবি চুরির সম্বন্ধটা কী?

মেলামেশা আছে সেখানেই এ ধরনের ঈর্ষা থাকতে পারে।
মোটিভ খুব জোরালো মনে হচ্ছে না। এছাড়া অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে না কি?

একটা মানুষকে একবার দেখে সে ছবি আঁকতে পারে, তার এই দাবি মিথ্যে হতেও পারে। ছবি দেখে আঁকা সহজ। চমক লাগিয়ে ফাল্গুনী বেশি টাকা রোজগার করার চেষ্টা করছে হয়ত।
হুম। আর অন্য কিছু?

ফটোগ্রাফার নকুলেশবাবু নিজেও ছবি চুরি করে থাকতে পারেন।
কেন? নকুলেশবাবুর স্বার্থ কী?

তার ছবির প্রিন্ট আরও বিক্রি হবে এই স্বার্থে।
এটা সম্ভব বলে তোমার মনে হয়?

ব্যাবসাদারের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। আমেরিকায় ফসলের দাম বাড়াবার জন্য ফসল পুড়িয়ে দেয়।

ওই দলের মধ্যে হয়তো এমন কেউ আছে যে — নিশ্চিহ্ন ভাবে নিজের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে চায়।
কোনও দাগী আসামী?

এই সময় দরজায় টোকা পড়ল।
?

বাড়ীওয়ালা অধ্যাপক সোম হাজির হলেন।
ও — আপনি! আসুন, আসুন।

আজ পার্টি কেমন লাগল বলুন?
বেশ লাগল। সকলেই বেশ হাসিখুশী ভদ্রলোক মনে হল।

এই সুযোগ সিগারেট খাবার। বাড়ীওয়ালার সামনে ব্যোমকেশ দাঁত খিঁচোতে পারবে না।

এই নিন, সিগারেট।
ধন্যবাদ। মিসেস বক্সী, ওখানে কাকে সবচেয়ে ভাল লাগল বলুন শুনি।

রজনী কে। ভারি সুন্দর স্বভাব, আমার বড্ড ভাল লেগেছে। যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি মিষ্টি কথা, আর ভারি বুদ্ধিমতী।

আচ্ছা, মহীধরবাবু এখনও মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন না কেন? ওঁর তো টাকার অভাব নেই।

বিধবা! বিধবা! বিধবা কে কোন হিঁদুর ছেলে বিয়ে করবে?

সকলেই চমকে উঠে দরজায় তাকালাম।

বিশ্বাস হচ্ছে না? উনি জানেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। এখানে সবাই জানে।

অতি বড় বেহায়া না হলে বিধবা মেয়ে আইবুড়ো সেজে বেড়ায় না। দুকান কাটার কি লজ্জা আছে?
অত যে ছলা – কলা ওসব ছেলে ধরবার ফাঁদ।

তিনি যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি চলেও গেলেন

আমাকে আপনারা মাফ করবেন। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় সব ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাই।
রজনী কি সত্যিই বিধবা?

হ্যাঁ। চোদ্দ বছর বয়েসে বিধবা হয়। মহীধরবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কৃতী ছাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের দুদিন পরে সে বিলাত যাত্রা করে, মহীধরবাবুই পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পথেই বিমান দুর্ঘটনায় সে মারা যায়। রজনীকে কুমারী বলা চলে।
আপনারা আমার পারিবারিক অবস্থা তো বুঝতেই পেরেছেন। আমার জীবনের ইতিহাস ও অনেকটা এরকম। গরীবের ছেলে, ছাত্র হিসাবে ভাল। বিয়ে করে শ্বশুরের টাকায় বিলেত যাই। কিন্তু ডপসং হার টা অন্যরকম হল। বিলেত থেকে ফিরে অধ্যাপক হলাম। কিন্তু বেশিদিন টিকতে পারলাম না। সাত বছর কাজ ছেড়ে এখানে আছি। এমনিতে অভাব নেই, আমার স্ত্রীর অনেক টাকা।

কাজ ছেড়ে দিলেন কেন?
লজ্জায়। স্ত্রী স্বাধীনতার যুগে স্ত্রী কে ঘরে বন্ধ করে রাখা যায় না – অথচ –।

মাঝে মাঝে ভাবি, বিমান দুর্ঘটনাটা রজনীর স্বামীর না হয়ে যদি আমার হত তবে সব দিক দিয়েই সুরাহা হত।

সোম দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।
প্রোফেসর সোম, যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রশ্ন করি। পিকনিকের যে ছবিটা আপনি কিনেছিলেন সেটা কোথায়?

সেটা আমার স্ত্রী কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তাতে আমি আর রজনী পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম।

যে যাই বলুক, রজনী ভারি ভালো মেয়ে। কম বয়েসে বিধবা হয়েছে, বাপ যদি সাজিয়ে গুজিয়ে রাখতে চান তাতে দোষ কী?

আজ পার্টি তে একটা ঘটনা লক্ষ্য করলাম। মহীধরবাবু তখন ছবি চুরির গল্প করছিলেন, সবার দৃষ্টি তাঁর দিকেই ছিল। ডাক্তার ঘটক একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, রজনী চুপিচুপি একটা কাগজ ভাঁজ করে তার পকেটে ফেলে দিল।

তারপর রজনী সরে এল। আমার মনে হয় আমি ছাড়া কেউ লক্ষ্য করেনি। মালতী দেবী ও না।

ব্যোমকেশের শরীর এ কদিনে আরও সেরেছে। একদিন তিনজনে বেড়াতে বেরিয়েছি, প্রফেসর সোম এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।
চলুন, আজ আমিও আপনাদের সহযাত্রী।

মিসেস সোম কি –?
তাঁর সর্দি হয়েছে। শুয়ে আছেন।

নানা কথা আলোচনা করতে করতে আমরা ঘুরতে লাগলাম।
আচ্ছা বলুন দেখি, ওই ছবিখানা কাগজে বা পত্রিকায় ছাপানোর কোনও কথা হয়েছিল?
কই আমি তো কিছু শুনিনি। নকুলেশবাবু মাঝে কলকাতায় গিয়েছিলেন বটে। তবে কার্ডকে কিছু না জানিয়ে ছবি ছাপতে দেবেন বলে মনে হয় না।

বিশেষত ডেপুটি উষানাথবাবু জানলে খুব রাগ করবেন।

কেন? উষানাথবাবু রাগ করবেন কেন?
উনি একটু অদ্ভুত গোছের লোক। বাইরে বেশ গ্রাম্ভারি, কিন্তু ভিতরে খুব ভীতু। বিশেষ করে ইংরেজ মনিবকে যমের মত ভয় খান।

সাহেবরা বোধহয় চান
একজন হাকিম সাধারন
লোকের সঙ্গে ফটো তু
তাই ছবি তোলাতে ওন
ভীষণ আপত্তি।

এ ছাব যাদ কাগজে ছাপা হয় নকুলেশবাবুর কপালে দুঃখ আছে।
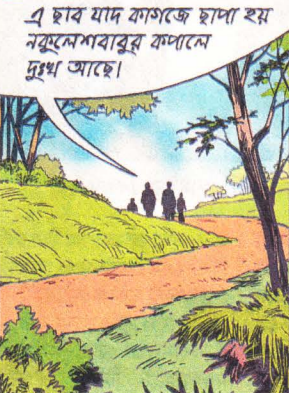
উষানাথবাবু কি সবসময় কালো চশমা পরে থাকেন?
হ্যাঁ। উনি বছর দেড়েক হল এখানে বদলি হয়ে এসেছেন। এর মধ্যে কখনও ওনাকে

হয়তো ওনার চোখের কোনও সমস্যা আছে।
আলো সহ্য করতে পারেন না।

ফটো গ্রাফার নকুলেশ সরকার লোকটি কেমন?
চতুর ব্যাবসাদার, ঘটে বুদ্ধি আছে। মহীধরবাবুকে খোসামোদ করে চলেন; শুনেছি তাঁর কাছে টাকা ধার করেছেন।

তাই নাকি? কত টাকা?
তা ঠিক জানি না। তবে মোটা টাকা।

এমন সময় একটা মোটর বাইক এগিয়ে এল –
ভট – ভট – ভট – ভট

সামনে এসে বাইক থেমে গেল। ডি এস পি পুরন্দর পান্ডে।
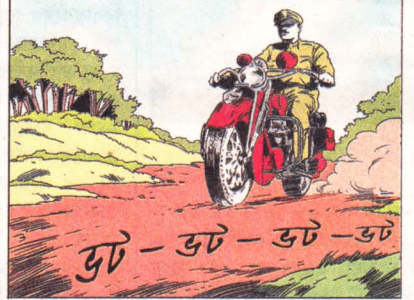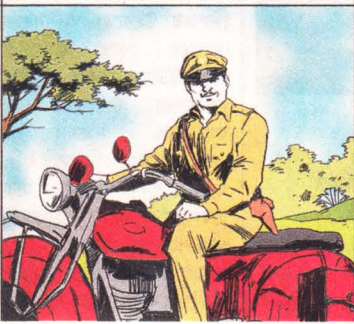
কুশল বিনিময়ের পর
ফালগুনী পাল আপনার ছবি একেছে?

তাজ্জব ব্যাপার মশাই, পরেরদিন ই ছবি নিয়ে সে হাজির। একেবারে হুবহু এঁকেছে। সত্যি গুনী লোক। টাকাটা দিতেই হল।

কোথায় থাকে সে?
আর বলবেন না। ওরকম গুন, কিন্তু একেবারে হতভাগা।

পাঁড় নেশাখোর, – মদ গাঁজা, গুলি কোকেন কিছুই বাদ যায় না। মাস খানেক এখানে এসেছে। যেখানে সেখানে পড়ে থাকত।

মহীধরবাবু দয়া করে থাকতে দিয়েছেন। ওঁর বাগানের কোনে একটা মেটে ঘর আছে, দুদিন থেকে সেখানেই আছে।

আপনি এদিকে কোথায় চললেন?
মহীধরবাবুর বাড়ি। নকুলেশ বাবুর মুখে শুনলাম তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। একবার খবর নিয়ে যাই ভাবলাম।

তাই নাকি? কী হয়েছে?
সামান্য সর্দিকাশি। কিন্তু ওনার হাঁপানির ধাত আছে।

তাই তো, আমারও দেখতে যাওয়া উচিত। মহীধরবাবু আমাকে বড়ই ভালবাসেন।
বেশ তো। আমার গাড়ির পিছনে উঠে বসে পড়ুন। একসাথেই যাই।

মহীধরবাবুকে বলে দেবেন, আমরা কাল বিকেলে যাব।
আচ্ছা, নমস্কার।

বাইক চলে গেল। ব্যোমকেশ দেখলাম হাসছে।
ভট-ভট-ভট-ভট

বাড়ি ফিরে আমরা চা খেতে বসলাম। তখনি সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ হল।
অধ্যাপক সোম মিস্টার পান্ডের বাড়িতে গেছেন। অন্য কিছু বলবে না। মনে রেখ সবাই।

মালতী দেবী দরজায় এসে দাঁড়ালেন।
আসুন, মিসেস সোম।
না, আমার শরীর ভালো নয়। উনি আপনাদের সঙ্গে বেরিয়ে কোথায় গেলেন?

পান্ডে সাহেবের সাথে পথে দেখা হয়েছিল, তিনি প্রফেসরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

পুলিসের পান্ডে? ওঁর সঙ্গে তাঁর কি দরকার?

তা তো কিছু শুনলাম না। পান্ডে বললেন, চলুন – আমার বাড়িতে চা খাবেন। হয়ত কোনও কাজের কথা আছে।

মালতী দেবী আর কিছু না বলেই ওপরে চলে গেলেন।

মিথ্যে বলতে হল। উপায় ছিল না। বাড়িতে দাম্পত্যে দাঙ্গা হওয়াটা কি ভাল?

তোমাদের সহানুভূতি কেবল ছেলেদের দিকে। মিসেস সোম যে সন্দেহ করেন সে নেহাত মিছে নয়।
আর তোমাদের সহানুভূতি কেবল মেয়েদের দিকে। স্বামীর ভালবাসা না পেলে তোমরা হিংসেয় চৌচির হয়ে যাও, কিন্তু কি করে স্বামীর ভালবাসা রাখতে হয় তা জানো না।

যাক, অজিত, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ভাই। বাইরের বারান্দায় পাহারা দিতে হবে। সোম ফিরলেই তাকে চেতিয়ে দেওয়া দরকার। নৈলে মিথ্যে কথা ধরা পড়লে সোম তো যাবেই, সঙ্গে আমাদেরও কপালে অশেষ দুর্গতি হবে।

অজিত বারান্দায় বসে মনের সুখে সিগারেট টানতে টানতে প্রফেসারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ভট – ভট – ভট – ভট

একটু পরেই পান্ডের বাইকের শব্দ হল। সোমকে নামিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি।

প্রফেসর বারান্দায় উঠতেই
একবার আসুন। শুনে যান। কথা আছে।

সোমের মুখ গম্ভীর, ব্যোমকেশ বসার ঘরে একলাই ছিল।
মহীধরবাবু কেমন আছেন?
ভালই।

ওখানে আর কেউ ছিল নাকি?
শুধু ডাক্তার ঘটক।

ব্যোমকেশের মুখে মালতী – সংবাদ শুনে সোমের মুখে হাসি ফুটল।
ধন্যবাদ।

পরদিন সকাল। প্রাতরাশের সময় দেখা গেল দাম্পত্য কলহ বাড়ির ওপর তলা থেকে নিচের তলায় নেমে এসেছে।

সত্যবতীর মুখ ভারি, ব্যোমকেশের ঠোঁটে বাঁকা কঠিনতা।

খাওয়া শেষ হলে
অজিত, চলো। আজ সকালবেলা একটু বেরোনো যাক।

বেশ, চলো। সত্যবতীও তৈরী হয়ে নিক।

আমার বাড়িতে ঢের কাজ আছে। সকাল বিকেল টো টো করে বেড়ালে চলে না।

ব্যোমকেশ উঠে পড়ল।
আমরা দুজনে যাব, এই ভেবে বলেছিলাম। চলো, মিছে বাড়িতে বসে থেকে লাভ নেই।

সত্যবতী ব্যোমকেশের পায়ের দিকে একটা কটাক্ষপাত করে
যার রোগা শরীর তার মোজা পায়ে দিয়ে বাইরে যাওয়া উচিত।

অজিত হাসি চাপতে না পেরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

একটু পরে ব্যোমকেশ বেরিয়ে এল। তার কপালে ভ্রূকুটি, কিন্তু পায়ে মোজা।

কিছুদূর যাবার পর একটা খালি রিকশা দেখে তাতে উঠে ব্যোমকেশ বলল
ডেপুটি উমানাথবাবু কা মোকাম চলো।
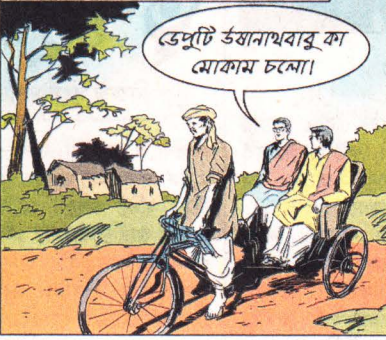
হঠাৎ উমানাথবাবু?
আজ রবিবার, তিনি বাড়ি থাকবেন। তাকে দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করার আছে।

ব্যোমকেশ, তুমি ছবি চুরির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ মনে হচ্ছে। ওতে সত্যি কি কিছু আছে?
সেটাই আবিষ্কারের চেষ্টা করছি বন্ধু।

উমানাথবাবুর বাড়ি হাকিমপাড়ায়। বাইরে রিকশাওলাকে অপেক্ষা করতে বলে আমরা প্রবেশ করলাম।

ভিতরে কয়েকজন পুলিসের লোক আর পান্ডে সাহেবের বাইক দেখতে পেলাম।
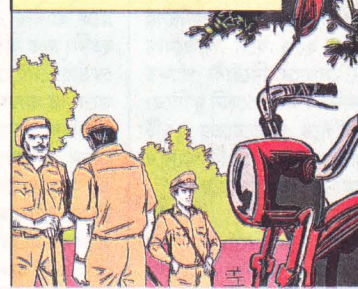
পান্ডে আর উমানাথবাবু বারান্দায় ছিলেন।
এ কি, আপনারা?

আজ রবিবার, তাই বেড়াতে এসেছিলাম।
আসুন। কাল রাত্রে বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে।

তাই নাকি? কি চুরি গেছে?
সেটা এখনও জানা যায়নি। রাতে এঁরা দোতলায় শোন। নিচে কেউ থাকে না। ঘর বন্ধ থাকে। কাল রাতে আপিস ঘরে চোর ঢুকে আলমারি খোলবার চেষ্টা করেছিল।

তালায় একটা চাবি ঢুকিয়েছিল, কিন্তু সেটা বের করতে পারেনি।
বটে, আলমারিতে কি ছিল?

সরকারী দলিল ছিল, আর আমার স্ত্রীর গয়নার বাক্স। স্টিলের আলমারি।
তাহলে চোর কিছু নিয়ে যেতে পারেনি?

সেটা আলমারি না খোলা অবধি বোঝা যাচ্ছে না। একটা চাবিওলা ডাকতে পাঠিয়েছি।
হুম। চোর ঘরে ঢুকল কি করে?

জানলার একটা কাচ ভেঙ্গে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনি খুলেছে। আসুন না দেখবেন।

উমানাথবাবুর অফিস ঘরে প্রবেশ করা হল।

ব্যোমকেশ কাচ ভাঙ্গা জানলা পরীক্ষা করল, আলমারির চাবি ঘোরাবার চেষ্টা করল।
নাহ। চাবি ঘুরছে না।

অফিস ঘরের পাশেই বসার ঘর। আমরা সেখানেই বসলুম।

চোর বোধহয় এ ঘরে ঢোকেনি।
এ ঘরে চুরি করবার মত কিছু —

আরে —!! তাই তো!? আমার পরী! পরী কোথায় গেল?

পরী!?
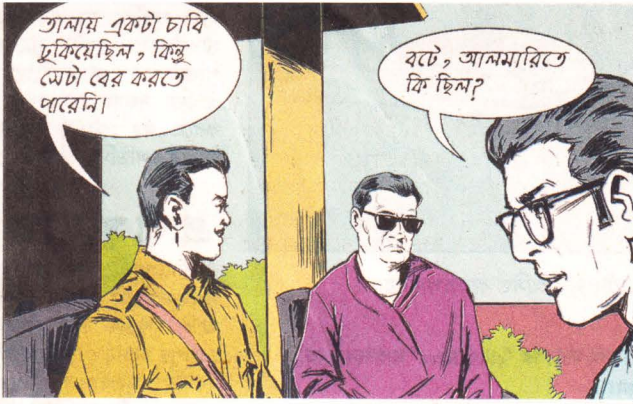
একটা রূপোলী গিলটি করা ছোট্ট পরী— ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী আমাকে উপহার দিয়েছিলেন —সেটা এখানেই ছিল। নিশ্চই চোরে নিয়ে গেছে।

আপনার ছেলে খেলা করবার জন্যে নিয়ে থাকতে পারে। একবার খোঁজ করে দেখুন না।
!
খোকা সভ্য ছেলে, সে কখনও কোনও জিনিসে হাত দেয় না। যাই হোক, আমি খোঁজ নিচ্ছি।

উমানাথবাবু ভেতরে গেলেন
কার্ডকে সন্দেহ করেন না কি?
না। সেরকম কিছু নয়। তবে একটা আরদালি বলছে, কাল রাত সাড়ে সাতটার সময় একজন পাগলাটে গোছের লোক ডেপুটি বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু উনি দেখা করেননি। বর্ণনা যেমন দিল তাতে করে মনে হয় –

ফাল্গুনী পাল?
হ্যাঁ, একজন সাব ইন্সপেক্টার কে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছি।

উমানাথ বাবু খোঁজ নিয়ে এসে জানালেন তার স্ত্রী পুত্র কেউ পরীর খোঁজ জানে না।
ভাল কথা, সেই ছবিটা আছে কিনা দেখেছিলেন?
কোন ছবি?

সেই যে একটা গ্রুপ ফটোর কথা মহীধরবাবুর বাড়িতে হচ্ছিল না?
ও – না, দেখা হয়নি। আপনার পাশেই তো অ্যালবাম টা রয়েছে। দেখুন না, ওতেই আছে।

ব্যোমকেশ অ্যালবাম নিয়ে পাতা উল্টে দেখতে লাগল
কই, দেখতে পাচ্ছি না তো?
সেকি? নেই!
কি জানি কোথায় গেল। কিন্তু এটা এমন কিছু দামি জিনিস নয়। আলমারি থেকে যদি দলিল বা গয়না গিয়ে থাকে –

আপনি ভাববেন না, চোর কিছুই চুরি করতে পারেনি। গয়না নিরাপদেই আছে, আপনার পরী ও একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে। আজ উঠি।

মিস্টার পান্ডে, চোরের যদি সন্ধান পান আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

উমানাথবাবু আমাদের সঙ্গে বাইরে এলেন
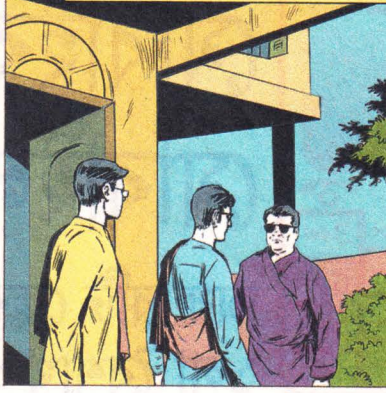
ব্যোমকেশকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনি কিছু বললেন
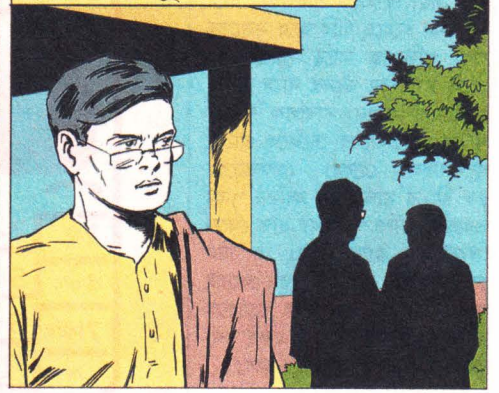
রিকশাওয়ালা অপেক্ষা করছিল। আমরা ফিরে চললাম।
অজিত, উমানাথবাবু একবার চশমা খুলে ফেলেছিলেন, তখন কিছু লক্ষ্য করেছিলে?
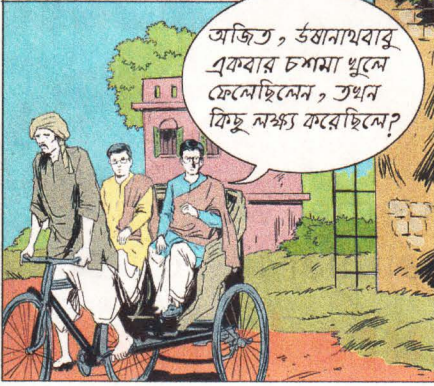
কই না। কী লক্ষ্য করব?
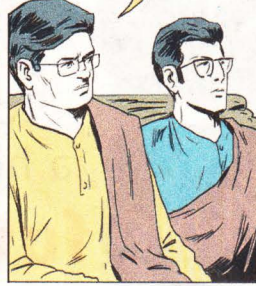
উমানাথবাবুর একটা চোখ পাথরের। তাই সবসময় কালো চশমা পরে থাকেন। তিন বছর আগে একটা চোখের ভেতর ফোঁড়া হয়েছিল। অপারেশন করে চোখটা বাদ দেওয়া হয়।

ওঁর সর্বদা ভয়, সাহেবরা একথা জানতে পারলে ওঁর চাকরি যাবে।
আচ্ছা ভীতু লোক তো! আলাদা করে এই কথাই বলছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ। অজিত, যাবার সময় তুমি প্রশ্ন করেছিলে, ছবি চুরির ব্যাপারটা ভাববার মত কি না। এখন বলছি — — ভাববার মতই বটে।
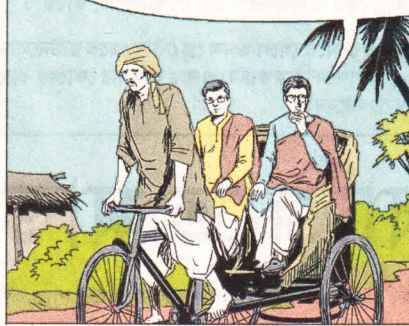
অ্যাঁ! তাই নাকি?
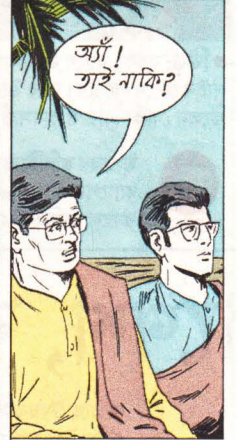
সন্ধেবেলা আমরা মহীধরবাবুর বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হলাম।
ঠাকুরপো, টর্চ নিয়ে যেও। ফিরতে রাত হবে নিশ্চয়।

তুমি এবেলাও তাহলে বেরুচ্ছ না?
না। ওপর তলায় একটা মানুষ অসুস্থ পড়ে আছে। তার কাছে দুদণ্ড কথা কইলেও তার মনটা ভালো থাকবে।

মালতী দেবীর প্রতি তোমার সহানুভূতি যে ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে দেখছি!
কেন বাড়বে না? নিশ্চয় বাড়বে।
আর রজনীর প্রতি সহানুভূতি মনে হয় সেই অনুপাতে কমে যাচ্ছে?
মোটেই না। একটু ও কমেনি।
রজনীর কি দোষ? যত নষ্টের গোড়া এই পুরুষ জাতটা।
দেখ, জাত তুলে কথা বললে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।
সত্যবতী নাক সিটকে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।
চলো, এবার বেরোনো যাক।
মহীধরবাবুর বাড়ি যখন পৌঁছলাম তখন খোলা ফটকে লোক নেই। আমরা ভেতরে ঢুকলাম।
সদর দরজা খোলা। দু তিনবার গলা খাঁকারি দেবার পর একজন বেরিয়ে এল।
কর্তা বাবু ওপরে শুয়ে আছেন। দিদিমনি বাগানে। বসুন। আমি দিদিমনিকে ডাকছি।
ডাকার দরকার নেই। আমরাই দেখছি।
বাগানে নেমে ব্যোমকেশ একটা কোন লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল
গাছপালা, ঝোপঝাড়ে বেশিদূর দেখা যায় না। বুঝলাম আমরা ফালগুনী পালের খোঁজে চলেছি।
বাগানের কোনে একটা মাটির ঘর।

ঘরের দরজা খোলা, ভেতরে অন্ধকার। ব্যোমকেশ টর্চ জ্বালল।

ফাল্গুনী বেরিয়ে এল
আপনারা কি পুলিসের লোক? খানাতল্লাস করতে চান? আসুন, দেখুন যত খুশি। আমি গরিব, কিন্তু চোর নই।

আমরা সে জন্য আসিনি। আপনাকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। কাল রাতে আপনি উমানাথ বাবুর বাড়ি কেন গেছিলেন?
তাঁর একটা ছবি এঁকেছিলাম। তাই দেখাতে গিয়েছিলাম। দারোয়ান তাড়িয়ে দিলে। বেশ কথা, ভাল কথা। কিন্তু সেজন্য পুলিস লেলিয়ে দেবার কি দরকার?

ভারি অন্যায়। আমি পুলিসকে বলে দেব, তারা আপনাকে আর বিরক্ত করবে না।
ধন্যবাদ।

ফাল্গুনী আবার কোটরে প্রবেশ করল। আমরা ফিরে এলাম।
রজনী কে বাগানে পাওয়া গেল না।

বাগানে পাথরের চাঙড় দিয়ে নকল পাহাড় তৈরি করে সাজানো। তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় –
ছবি, ছবি, ছবি। কি হবে ছবি! চাইনা ছবি!

চুপ চুপ, কেউ শুনতে পাবে।
আমি তোমাকে চাই– তোমাকে। দুধের বদলে জল খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না।

আর আমি! আমি কি চাই না? কিন্তু উপায় যে নেই।
উপায় আছে, তোমাকে বলছি।

কিন্তু বাবা –

গলা দুটো চেনা গেল।
ডাক্তার ঘটক আর রজনী।
তুমি নাবালিকা নও। তোমার বাবা তোমাকে আটকাতে পারেন না।

তা জানি। কিন্তু বাবার এখন শরীর খারাপ। আগে সেরে উঠুন – তারপর –
না। আজই আমি জানতে চাই তুমি রাজী আছ কি না।

আচ্ছা, আজই বলব। তবে এখন নয়। আজ রাত সাড়ে দশটায় তুমি এস।

আমি এখানে থাকব। তখন কথা হবে। এখন হয়ত বাড়িতে কেউ এসেছে, আমাকে না দেখলে –

ব্যোমকেশ আমার হাত ধরে টেনে নিল।

একজন লোক নিঃশব্দে দূরে চলে গেল। ডাক্তার ঘটক না অন্য কেউ বোঝা গেল না।

আমরাও নিঃশব্দে অনেকটা সরে এলাম।
চলো, বাড়ি ফেরা যাক। আজ আর দেখা করে কাজ নেই।

টর্চ জ্বেলে বাড়ির দিকে ফিরে চললাম।

ওরা ছাড়াও অন্য একজন ছিল। তাকে চিনতে পারলে?
না। কে তিনি?

অন্য লোকটি হচ্ছেন আমাদের গৃহস্বামী অধ্যাপক আদিনাথ সোম।
তাই নাকি! ব্যোমকেশ, ব্যাপারটা আমার পক্ষে বেশ জটিল হয়ে উঠেছে।

ছবি চুরি, নেশাখোর চিত্রকর, কানা হাকিম, অবৈধ প্রনয়, অধ্যাপকের আড়িপাতা – কিছু বুঝতে পারছি না।
না পারার ই কথা। রবীন্দ্রনাথের গান মনে আছে –

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে, জীবন – বীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে? – আমিও এই তারের জট ছাড়াতে পারছি না।

আচ্ছা, এই যে ডাক্তার আর রজনীর ব্যাপার, এতে আমাদের কিছু করা উচিত নয় কি?
কিছু নয়। আমরা খেলার দর্শক, হাততালি দেব, দুয়ো দেব, কিন্তু মাঠে নেমে ঝগড়া দেওয়া আমাদের পক্ষে বেয়াদপি।

বাড়ি ফিরে দেখি সত্যবতী একা পশমের গেঞ্জি বুনছে –
এই যে, তোমার রোগীর খবর কি?

উত্তর না দিয়ে আরও তাড়াতাড়ি কাঁটা চালাতে লাগল।
মুখে কথা নেই যে! মালতী দেবীকে দেখতে গিয়েছিলে তো?
গিয়েছিলাম।
সত্যবতীর মুখ ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠল।

ব্যোমকেশ সত্যবতী কে দেখে এবার আচমকা হো হো করে হেসে পাশের ঘরে চলে গেল।
!

কি ব্যাপার খুলে বল দেখি।
কিছু না। চা খাবে তো? জলটা চড়িয়ে এসেছি। দেখি –
সত্যবতী উঠে পড়ার চেষ্টা করল

আহা, কী হয়েছে আগে বল না। চা পরে হবে।
কী আবার হবে, ওই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষ টার কাছে আমার যাওয়াই ভুল হয়েছিল। এমন পচা নোংরা মন – আমাকে বলে কিনা–

কিন্তু সে আমি বলতে পারব না। খুব নোংরা– যার অমন মন তার মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে হয়।
হা – হা – হা – হা
ইসস!
ভেতরের ঘর থেকে আবার ব্যোমকেশের হাসি শোনা যেতে লাগল।

রাতে ঘুম আসছিল না। জানলা খুলে সিগারেট টানতে লাগলাম

একটা ছায়ামূর্তি ওপরের বারান্দা থেকে নেমে সামনের পথে বেরিয়ে গেল। কোট প্যান্ট পরা অধ্যাপক সোম।

একটু পরেই আবার কেউ নেমে আসার শব্দ পেলাম।
এবার মালতী দেবী

সোম যে পথে গিয়েছিলেন তিনিও সেদিকেই চলে গেলেন।
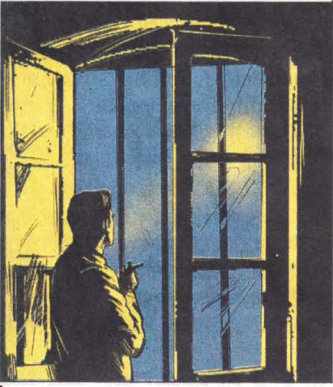
আমি সিগারেট হাতে পাহারায় রইলাম।

খানিকপরেই ফিরলেন মালতী দেবী। মনে হয় অন্ধকারে অধ্যাপককে বেশিদূর অনুসরন করতে পারেন নি।
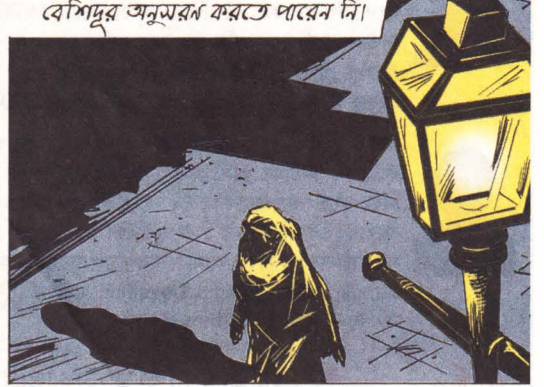
সোম ফিরলেন অনেক পরে। প্রায় সাড়ে এগারোটায়।

সকালে ব্যোমকেশকে রাতের ঘটনা বললাম। তখনই একজন কনস্টেবল এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল।

ডি এস পি পান্ডে সাহেব লিখেছেন।

উষানাথ বাবুর আলমারি থেকে কিছু চুরি যায় নি। পরী এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। চোরের ও কোনও সন্ধান নেই।

এইসময় নকুলেশ বাবু সবেগে এসে উপস্থিত হলেন
এই যে নকুলেশবাবু! কি খবর?

এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম খবরটা দিয়ে যাই- শুনেছেন কি? ফালগুনী পাল মারা গেছে।

সে কি !?
হ্যাঁ। মহীধরবাবুর বাগানে, কুয়োয় ডুবে মরেছে।

কখন এ ব্যাপার হোল?

বোধহয় কাল রাতে। মাতাল দাঁতাল লোক, অন্ধকারে তাল সামলাতে পারে নি, পড়েছে - আজ সকালে আমি ওখানে গেছিলাম। দেখি মালীরা কুয়ো থেকে লাশ তুলছে।

আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম
?

আচ্ছা। আমি আজ আসছি তবে। আমাকে আবার ক্যামেরা নিয়ে যেতে হবে।

বসুন, বসুন। চা খেয়ে যান।
চায়ের আমন্ত্রন উপেক্ষা করতে না পেরে নকুলেশবাবু বসে পড়লেন।

সেই ফটোর নেগেটিভটা খুঁজে ছিলেন কি?
কোন ফটো? - ও হ্যাঁ -। অনেক খুঁজেছি মশাই। পেলাম না। থাকলে আমার দু পয়সা আমদানি হত।

আচ্ছা, সেই ফটোতে কে কে ছিল বলুন তো?
পিকনিকের ফটো তো - আমি, মহীধরবাবু, তার মেয়ে রজনী, ডাক্তার ঘটক, সস্ত্রীক প্রফেসর সোম, উষানাথ বাবুর পরিবার, আর ব্যাঙ্ক ম্যানেজার অমরেশ রাহা। সকলেই।

সকলেই ফটো চায় ছিলেন। ভারি ভালো হয়েছিল ছবিটা। কি যে হোল! আচ্ছা চলি তাহলে। আর একদিন আসব।

নকুলেশবাবু চলে গেলেন। আমরা কিছুক্ষন চুপ করে বসে রইলাম। একটু পরে ব্যোমকেশ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।
এমন যে হতে পারে সে সম্ভাবনা আমার মনেই আসেনি। চলো, বেরোনো যাক।

আমরা বেরতেই দেখলাম প্রফেসর সোম ড্রেসিং গার্ডন পরেই নেমে এসেছেন।
কি খবর?

খবর ভালো নয়। স্ত্রীর অসুখ খুব বেড়ে গেছে। বোধহয় নিউমোনিয়া। জ্বর বেড়েছে, মাঝে মাঝে ভুল বকছে।
ডাক্তার ঘটক কে খবর দিয়েছেন?

ঘটক কে ডাকব না। আমি অন্য ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি।
কেন? ঘটকের ওপর আপনার বিশ্বাস নেই? আমার বেলায় কিন্তু আপনি ওকেই সুপারিশ করেছিলেন।

সোম চুপ করে রইলেন
যাই হোক, এইমাত্র খবর পেলাম ফাল্গুনী পাল কুয়োয় পড়ে কাল রাতে মারা গেছে।

ও – তাই বুঝি। হয়তো সুইসাইড করেছে। আর্টিস্ট রা একটু পাগলাটে হয় –

প্রফেসর সোম, কাল রাত এগারোটায় আপনি কোথায় ছিলেন?

আ – আ – আমি! কে বললে আমি কোথাও গিয়েছিলাম? আমি তো –

মিছে কথা বলে লাভ নেই। আপনার স্ত্রীর যে আজ বাড়াবাড়ি হয়েছে তার জন্য আপনি দায়ী। কাল আপনার পেছন পেছন তিনিও ওই শীতে বেরিয়েছিলেন।

আ – আমার স্ত্রী! ব্যোমকেশ বাবু বিশ্বাস করুন, আ – আমি জানি না।
কিন্তু আমরা জানি। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই সতর্ক করে দিলাম। আপনি সাবধানে থাকবেন। এসো অজিত।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে
সোম কে খুব
ভয় পাইয়ে দিয়েছি।
একবার ব্যাঙ্কে যেতে
হবে। কিন্তু তার আগে-

একবার ঘটকের
ডিসপেনসারি তে
ঢুঁ মেরে যাই চলো।

ভিতরে ঢুকতে যাবার সময় শোনা গেল
দেখুন, আপনার ছেলের
টাইফয়েড হয়েছে, সারতে
সময় লাগবে। লম্বা কেস
আমি এখন হাতে নিচ্ছি না।
আপনি বরং শ্রীধর বাবুর
কাছে যান।

একজন লোক বেরিয়ে যেতে
আমরা ঢুকলাম।
আসুন - আসুন। রোগী
যখন সশরীরে ডাক্তারের
কাছে আসে তখন বুঝতে
হবে রোগ সেরেছে।

এখন আপনিই বলুন, আমি
মানুষের ডাক্তার কিংবা
আপনি ঘোড়া।
হা হা হা হা -
আপনি মানুষের ডাক্তার,
এই কথা মেনে নেওয়াই
আমার পক্ষে সম্মান জনক।
মহীধরবাবু কেমন আছেন?

অনেকটা ভালো।
প্রায় সেরে উঠেছেন।
ফাল্গুনী পাল
মারা গেছে।
শুনেছেন?

সেই চিত্রকর!
কি হয়েছিল তার?
কিছু হয়নি।
কাল রাত্রে জলে
ডুবে মারা গেছে।
ব্যোমকেশ যেটুকু জানত
সংক্ষেপে বলল।
ডাক্তার কিছুক্ষন বিমনা
হয়ে রইল।
আমার একবার যাওয়া
উচিত। মহীধরবাবুর
দুর্বল শরীর -

আপনি কলকাতা যাচ্ছেন কবে?
ডাক্তার কিছুক্ষণ স্থির ভাবে ব্যোমকেশের দিকে তাকিয়ে রইল।
আমি কলকাতা যাচ্ছি কে বললে আপনাকে?
ব্যোমকেশ উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসল।
হ্যাঁ। শীগগিরই একবার যাবার ইচ্ছা আছে। আচ্ছা, উঠলাম। সময় পেলে ওবেলা আপনাদের বাড়ি যাব।
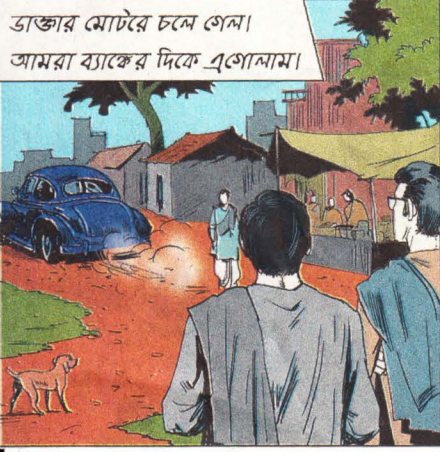
ডাক্তার মোটরে চলে গেল। আমরা ব্যাঙ্কের দিকে এগোলাম।

ডাক্তার কলকাতা যাচ্ছে তুমি জানলে কি করে? তুমি কি আজকাল হাত গুনছ না কি?
না। কিন্তু একজন ডাক্তার যখন বলে লম্বা কেস হাতে নিতে পারবে না, অন্য ডাক্তারের কাছে যাও, তখন মনে হয় যে সে বাইরে যাবে।

ANK
কিন্তু কলকাতায় যাবে তার নিশ্চয়তা কী?
ওটা তার প্রফুল্লতা দেখে আন্দাজ করেছি।

ব্যাঙ্কের ভিতর ম্যানেজার অমরেশ রাহার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।
নমস্কার। ভাগ্যে দেখতে পেলাম। নইলে তো টাকা নিয়েই চলে যেতেন।

রোজই ভাবি আপনাদের বাড়ি যাব, কিন্তু একটা না একটা কাজ পড়ে যায়। ব্যাঙ্কের চাকরি মানে অষ্টপ্রহর গোলামি।
এমন গোলামি তে সুখ আছে। হরদম টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন যে।

সুখ আর কই? চিনির বলদ। দিনের শেষে সেই গ্লাস জল। আসুন। আজ আপনাকে যখন পেয়েছি, একটু গল্প করা যাক।

অমরেশ বাবু আমাদের নিজের ঘরে না বসিয়ে দোতলায় নিয়ে গেলেন
নিচে কাজের হুড়োহুড়ি। এখানটাই বেশ নিরিবিলি।
দোতলা তেই বুঝি আপনার কোয়ার্টার?

হ্যাঁ, একা মানুষ তাই এই মাইনেতে ভদ্র ভাবে চলে যায়। বিয়ে – থা করলে হাড়ির হাল হত।

অনাড়ম্বর ঘর। দেওয়ালে ছবি নেই। মেঝেয় গালিচা নেই।
আপনারা বসুন। একটু চায়ের কথা বলে আসি।

ম্যানেজার বেরিয়ে গেলেন। ঘরে একটি মাত্র বইএর আলমারি। আমরা বই দেখতে লাগলাম।

অনেক রকম বই। গল্প উপন্যাস ই বেশি। আমার লেখা ব্যোমকেশের উপন্যাস ও আছে। ব্যোমকেশ একটা অন্যরকম ভাষায় লেখা বই দেখতে লাগল। অনেকটা হিন্দির মত মনে হল।
?

এটা কি ভাষায় লেখা হে ?

এইসময় অমরেশ বাবু ফিরে এলেন
আপনি গুজরাটি ভাষাও জানেন?

জানি আর কই? একসময় চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার দ্বারা হল না। ব্যাঙ্কের কাজে গুজরাটি জানা থাকলে খুব সুবিধা হয়।

আমরা বসলাম।
ফালগুনী পাল মারা গেছে শুনেছেন?
অ্যাঁ! বলেন কি? কবে? কোথায়? কিভাবে মারা গেল?

সব শোনার পর
ইসস্‌। বেচারা বড় দুঃখে পড়েছিল। কালই আমার কাছে এসেছিল।

কাল এসেছিল? কখন?
সকাল বেলা। কাল ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল। আমার একটা ছবি এঁকে নিয়ে হাজির।

তা, ছবিখানা কিনলেন নাকি?
কিনতেই হল। কিছুতেই ছাড়লে না। পাঁচ টাকার বদলে দশ টাকা আদায় করে নিয়ে গেল।

মৃত চিত্রকরের শেষ ছবিটা দেখতে খুব ইচ্ছা করছে।
দেখুন না। ভালই এঁকেছে বোধহয়। আমি অবশ্য ছবির কিছু বুঝি না। আনছি, দেখুন।

চা এসে পড়ল। অমরেশ বাবু ছবিখানা নিয়ে এলেন।

ব্যোমকেশ ছবিটা দেখতে লাগল।

সেদিন চায়ের পার্টি তে শুনেছিলাম পিকনিকের ছবিখানা চুরি গেছে। সেটা পাওয়া গেল কি না কে জানে।

চমৎকার ছবি! লোকটা যদি বেঁচে থাকত, আমিও ওকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নিতাম।
তাই নাকি! তাহলে দশটা টাকা জলে পড়েনি বলছেন?

অমরেশবাবু, ছবিখানা যত্ন করে রাখবেন। আজ ফাল্গুনী পালের নাম কেউ জানে না, কিন্তু একদিন আসবে যেদিন ওর আঁকা সোনার দরে বিক্রি হবে।

চা শেষ করে আমরা উঠে পড়লাম
আবার দেখা হবে। বছর শেষ হতে চলল। নববর্ষের ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে আমাকে হেড আপিসে দেখা করে আসতে হবে।

এবার নববর্ষে দুদিন ছুটি।

দুদিন ছুটি কেন?
একত্রিশে ডিসেম্বর রবিবার পড়েছে। শনিবার অর্ধেক দিন ধরলে আড়াই দিন ছুটি। আপনারা এখন কিছুদিন আছেন তো?

২ রা জানুয়ারি পর্যন্ত আছি বোধহয়।
আচ্ছা, নমস্কার।

ব্যাঙ্কের পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমরা বাজারে এলাম।
দাঁড়াও, সিগারেট কিনতে হবে।
আরে তাই তো! আমাকেও একটা জিনিস কিনতে হবে।

একটা বড়ো মনিহারীর দোকানে ঢুকলাম। আমি সিগারেট নিলাম, আর ব্যোমকেশ একটা দামি এসেন্সের শিশি কিনল।

দুপুরে একটু শুয়ে ছিলাম। সাড়ে তিনটে নাগাদ ঘুম ভেঙে গেল। ব্যোমকেশের ঘর থেকে মৃদু শব্দ পেলাম।

মনে হল কারা গল্প করছে। উঁকি মেরে দেখলাম –

ওহে কপোত কপোতী, তোমাদের কূজন শেষ হতে যদি দেরি থাকে তাহলে না হয় আমিই চায়ের ব্যাবস্থা করি।

সত্যবতী লজ্জা পেয়ে চলে গেল।
ব্যোমকেশ বেরিয়ে এল।

ব্যাপার কি? খুব ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়ছ যে?
পারমিশন পেয়ে গেছি। আজ থেকে যত খুশি।

চা পান শেষ হতে না হতেই ডাক্তার ঘটক এসে পড়লেন। তিনি মহীধর বাবুর বাড়ি থেকে আসছেন।

কি দেখলেন? ফাল্গুনীর মৃত্যুর কারণ জানা গেল?

অটপ্সি না হলে কিছু বলা সম্ভব নয়।

আপনি তো ডাক্তার, আপনি কি কিছুই বুঝতে পারলেন না?
না।

যাক সে কথা। মহীধরবাবু আর রজনী দেবী কেমন আছেন দেখলেন?

ওনারা সবাই ঠিক আছেন। আপনিও তো সেরে উঠেছেন। যাক। আজ উঠি তাহলে।
ডাক্তার উঠল। আমরাও উঠলাম।

দরজার কাছে এসে ব্যোমকেশ আচমকা প্রশ্ন করল
আপনার কলকাতা যাওয়া তাহলে স্থির?

ডাক্তারের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

ব্যোমকেশ বাবু, আপনি এখানে শরীর সারাতে এসেছেন, গোয়েন্দা গিরি করতে নয়।

যা আপনার এলাকার বাইরে তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

ডাক্তার গটগট করে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার ঘটক এমনিতে খুব ভালমানুষ, কিন্তু ল্যাজে পা পড়লে একেবারে কেউটে সাপ।

বাইরে মোটর বাইক থামার শব্দ হল।
আরে, পান্ডে সাহেব আসছেন। ভালই হল।

ব্যোমকেশ বাবু, আপনার কথা ফলে গেল। পরী উদ্ধার করতে পেরেছি।

বসুন। কোথা থেকে পরী উদ্ধার করলেন?

মহীধরবাবুর কুয়োয় পাওয়া গেছে। ফালগুনীর লাস বেরোবার পর ডুবুরি নামিয়েছিলাম। তারাই উমানাথ বাবুর পরী তুলেছে।
হুম! আর অন্য কিছু?

আর কিছু না। তবে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এ বলছে ফালগুনী জলে ডুবে মরেনি। মৃত্যুর পর তাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।
অর্থাৎ কেউ তাকে কাল রাতে খুন করেছে।

তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু ফালগুনীর মতন একটা অপদার্থ কে খুন করে কার কি লাভ?
লাভ নিশ্চয়ই আছে। অপদার্থ লোক হলেও ফালগুনী নির্বোধ ছিল না। তার বেঁচে থাকা কারো পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল।

আমি ভাবছি, পরীটা কুয়োয় এল কি করে? ওটা নিয়েই কি খুনির সঙ্গে ফালগুনীর কাড়াকাড়ি হচ্ছিল? কিন্তু পরীটা তো তেমন দামী জিনিস বলে মনে হল না।

ভালো কথা, ফালগুনীর গায়ে কি কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে?
না। কিন্তু তার পেটে অনেকখানি আফিম পাওয়া গেছে। মদের সঙ্গে।

বুঝেছি। দেখুন কিকরে তার মৃত্যু হয়েছে সেটা বড় কথা নয়, কেন মৃত্যু হয়েছে সেটাই আসল কথা।

এ বিষয়ে আপনি কি কিছু বুঝতে পেরেছেন?
বোধহয় কিছু কিছু বুঝেছি। আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু আপনার সময় হবে কি?

সময় হবে কি না দেখাচ্ছি। চলুন আমার বাড়িতে, একেবারে রাত্রির খাওয়া দাওয়া সেরে ফিরবেন।

পান্ডে ব্যোমকেশকে নিয়ে চলে গেল।

আমি আর সত্যবতী তাস নিয়ে রাত সাড়ে নটা অবধি গোলামচোর খেললাম।

ব্যোমকেশ ফিরতেই তাকে ধরলাম
কি করলে এতক্ষন ধরে?
আঃ! মুর্গিটা যা রেঁধেছিল না –

কথা চাপা দিও না। চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে কি কথা হল?
পুলিসের গুপ্তকথা কি বলতে আছে?

তবে এমন কোনও কথা হয়নি যা তুমি জানো না।
হত্যাকারী কে?

পাঁচকড়ি দে।

এই বলে সুট করে শোবার ঘরে ব্যোমকেশ ঢুকে পড়ল
!?

বড়দিন চলে গেল। ৩০ শে ডিসেম্বর শনিবার সকালবেলা আমরা নকুলেশবাবুর দোকানে হাজির হলাম। নীচে দোকান, ওপরে তার বাসস্থান।

নকুলেশবাবু ওপরে ছিলেন। মনে হল বাঁধা ছাদা করছিলেন। নেমে এলেন।
আসুন। ছবি তোলাবেন নাকি?

এখন নয়। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম আপনার দোকানটা একবার দেখে যাই।
বেশ বেশ। আমি কিন্তু ছবিটা ভালই তুলি। এখানকার অনেক কেষ্ট বিষ্টু আমাকে দিয়ে ছবি তুলিয়েছেন। ওই যে, দেয়ালে দেখুন।

বাঃ, বেশ ছবি। আপনি তো দেখছি একজন সত্যিকারের শিল্পী।

হে - হে। একটু চা হোক না কি?
চায়ের দরকার নেই। আমরা খেয়ে বেরিয়েছি। আপনি কোথাও যাবেন মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, দুদিনের জন্য কলকাতায় যাব। বৌ ছেলেকে আনতে।
আচ্ছা, আপনি গোছগাছ করুন। আমরা এলাম।

রিকশায় চড়ে ব্যোমকেশ বলল
স্টেশনে চলো।
ব্যাপার কী বলতো ? সবাই জোট বেঁধে কলকাতায় যাচ্ছে !

এই সময় কলকাতার একটা ভীষণ আকর্ষণ আছে হে।
আমাদের রিকশা স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল।

স্টেশনে পৌঁছে ব্যোমকেশ নামলো না। ইশারা করতেই রিকশা ওলা গাড়ি ঘুরিয়ে বাইরে নিয়ে চলল।
কী হোলো? নামলে না?

তুমি বোধহয় লক্ষ্য করনি, টিকিট ঘরের সামনে ডাক্তার ঘটক টিকিট কিনছিল।
!

বাজারের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একটা বড় মনিহারী দোকানের সামনে দেখলাম মোটর দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যোমকেশ রিকশা থামিয়ে নামল, আমিও নামলাম।
আবার কি মতলব? আরও এসেন্স চাই না কি?
আরে – না – না –

তবে কি কেশতৈল? তরল আলতা?
এসই না। দেখবে।

দোকানে ঢুকে দেখলাম উমানাথ বাবু সুটকেস কিনছেন
আপনিও কি কলকাতা যাচ্ছেন না কি ?
অ্যাঁ ! আ – আমি ?

না না। আমি ট্রেজারি অফিসার, আমার কি স্টেশন ছেড়ে যাবার উপায় আছে? একথা কে বললে আপনাকে ?

কেউ বলেনি। আপনি সুটকেস কিনছেন দেখে অজিত ভেবেছিল – যাক, আপনার পরী পেয়েছেন?
হ্যাঁ। পেয়েছি।

উমানাথ বাবু মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার দোকানদারের সাথে কথা বলতে লাগলেন।

আমরা বেরিয়ে এসে রিকশায় উঠলাম
কি ব্যাপার ? উনি অমন চটে গেলেন কেন বলতো ?
কি জানি। হয়ত মেজাজ গরম ছিল। কিংবা –

আভি কিধার যানা হ্যায় ?
ডি এস পি পান্ডে সাহেব।

পান্ডে সাহেবের বাড়িতেই অফিস। আমাদের স্বাগত করলেন।
সব ঠিক আছে তো ?

সব ঠিক আছে। রাত সাড়ে দশটায় ট্রেন। সওয়া এগারোটায় জংশন এ পৌঁছবে।
কলকাতার ট্রেন কখন ?

পৌনে বারোটায়।
আর পশ্চিমের মেল?

এগারোটা পঁয়ত্রিশ।

বেশ। তাহলে ওবেলা পাঁচটার সময় আমি মহীধর বাবুর বাড়িতে যাব। আপনি সাড়ে পাঁচটায় আসবেন। মহীধর বাবু যদি আমার অনুরোধ না রাখেন, পুলিসের কথা নিশ্চয় অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।

হ্যাঁ, আমার ও তাই বিশ্বাস।

পান্ডের কাছ থেকে বেরিয়ে আমরা ব্যাঙ্কে গেলাম কিছু টাকা তোলার ছিল।
অমরেশ বাবু এগিয়ে এলেন।
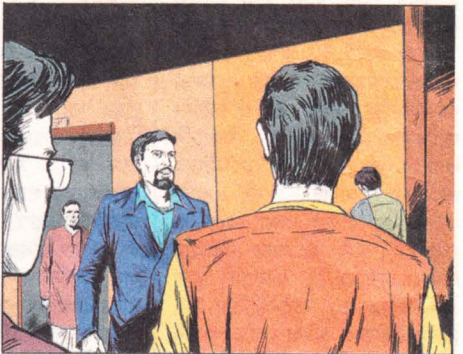
এই বেলা যা দরকার টাকা বার করে নিন। কাল পরশু ব্যাঙ্ক বন্ধ।
আপনি ফিরছেন কবে?

পরশু রাতেই ফিরে আসব।

আমরা টাকা তুলে ফেরার সময় দেখলাম ডাক্তার ঘটক ব্যাঙ্কে ঢুকলেন। আমাদের দেখেও না দেখার ভান করলেন।
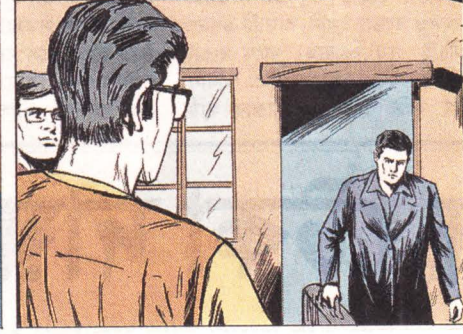
বিকাল পাঁচটায় আমরা মহীধর বাবুর বাড়িতে উপস্থিত হলাম।
আসুন, আসুন। অনেকদিন বাঁচবেন। এইমাত্র আপনার কথাই ভাবছিলাম।

এখন কেমন আছে শরীর ?
এখন ভালই। কিন্তু একটা বড় ভাবনার কারন হয়েছে।

রজনীর এক মাসি কলকাতায় থাকেন। কাল বিকালে তার এল, তিনি অসুস্থ। রজনী তাঁর কাছেই মানুষ হয়েছে। খবরটা পেয়ে কাল রাতের গাড়িতেই চাকর রামদিনকে নিয়ে সে কলকাতা বেরিয়ে গেছে।

ঠিকমতো পৌঁছে গেছে কি না খবর পাননি আপনি?
সে খবর দিয়েছে। এই অবধি কোনও গোলমাল নেই। কিন্তু তারপর আজ সকালে সেই মাসির একখানা চিঠি এসেছে।

তাতে অসুখ – বিসুখের কোনও খবর নেই। নেহাত ই মামুলী কথা।
তাতে অবাক হচ্ছেন কেন? হয়ত চিঠিটা লেখার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

তা হতেও পারে। কিন্তু আমার ভাবনা অন্য চিঠিখানা নিয়ে।
অন্য চিঠি! কে লিখেছে?

বেনামী চিঠি। এই যে, পড়ে দেখুন।

এখানকার ডাকঘরের ছাপ দেখছি। মানে এখান থেকেই কেউ পাঠিয়েছে।

আপনার চোখের আড়ালে একজন ভদ্রবেশী দুষ্ট লোক আপনার কন্যার সাথে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছে। ইহারা যদি ইলোপ করে, কেলেঙ্কারির একশেষ হইবে। সাবধান! ডাক্তার ঘটক কে বিশ্বাস করিবেন না।

কে লিখেছে জানি না। কিন্তু এ যদি সত্যি হয় –
আপনি ভাববেন না। কোনও কেলেঙ্কারি হবে না। মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন আপনি।

আমি এমন অনেক কথা জানি যা আপনি জানেন না। আপনার মেয়ে দুদিন পরেই ফিরে আসবেন।
সত্যি বলছেন? কিন্তু আপনি কি করে জানলেন? আপনি তো –

উফফফ! আপনার কথায় যে কি শান্তি পেলাম তা কি বলব! বুড়ো হয়েছি, ভগবান একবার দাগা দিয়েছেন তো – তাই একটুতেই ভয় হয়।

ওসব কথা ভুলে যান। আমি এসেছিলাম অন্য একটা অনুরোধ নিয়ে।
বলুন বলুন।
আপনার মোটরখানা আজ রাত্রে একবার দিতে হবে। জংশনে যাবো। একটু দরকারি কাজ আছে।

এ আর বেশি কথা কি? কখন চাই বলুন?
রাত নটার সময়।

বেশ, ঠিক নটার সময় আমার গাড়ি আপনার বাড়ির সামনে হাজির থাকবে। আর কিছু?
না। আর কিছু না।

সেদিন রাত ঠিক নটায় –
মহীধরবাবুর গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।
POLICE

আমি, ব্যোমকেশ আর পান্ডে সাহেব তাতে বসলাম। একটা পুলিস ভ্যান আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা আমাদের পিছু নিল।
POLICE DEPARTMENT

আপনার আসামী ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনবে।
আমারও তাই মনে হয়। যে ক্লাসেই উঠুক, ইন্সপেক্টার দুবে তার পাশের কামরায় থাকবে।

পুলিস মহলে আসল কথা কে কে জানে?
আমি আর দুবে। পিছনে ভ্যানে যারা আছে তারাও জানে না কি হচ্ছে।

থানা থেকে যত কথা বেরোয় এত আর কোথাও থেকে নয়। ঘুষ খোর পুলিস তো আছেই। পুলিসের পেটে কথা থাকে না।

দশটার সময় জংশনে পৌঁছলাম।
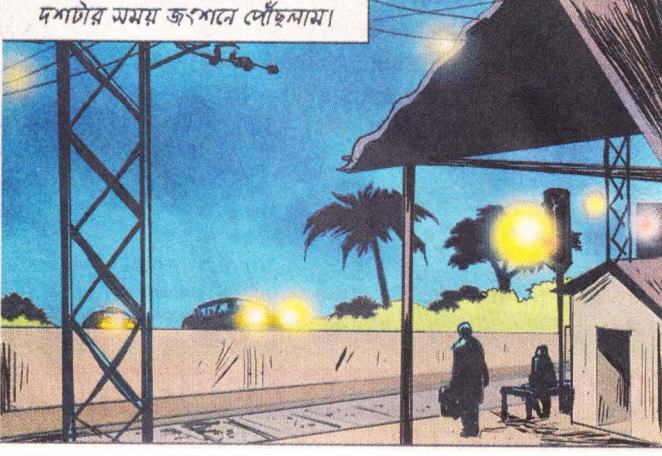
ভ্যানের পুলিসদের পান্ডে স্টেশনের ভেতরে – বাইরে ছড়িয়ে দিলেন। তারপর স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে কথা বললেন।
আমার লগ আসবে। এলেই খবর দেবেন। ওয়েটিং রুম এ আছি।

গাড়ি আসবার ঘন্টা বাজতেই আমরা প্ল্যাটফর্মে প্রথম শ্রেণীর কামরা যেখানে থামবে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ট্রেন এসে দাঁড়াতেই একজন কুলি ছুটে ভেতরে গেল

কুলি ভেতর থেকে দুটি চামড়ার সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে এল। একটি মাত্র যাত্রী বাইরে বেরিয়ে এলেন।
ব্যোমকেশ আর পান্ডে সাহেব লোকটার দিকে এগিয়ে গেলেন

কি ব্যাপার?
আপনার যাওয়া হবে না অমরেশ বাবু! আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

মুহূর্তের মধ্যে দুদিক দেখে নিয়ে অমরেশবাবু পকেট থেকে পিস্তল বার করলেন

-না-আ-আ-

নিজের কপালে ঠেকিয়ে ঘোড়া টিপলেন

চড়াৎ

পি-ই-ই-ই-ই-ই
পান্ডে হুইসেল দিলেন - পুলিসের লোক এসে জায়গাটা ঘিরে ফেলল

ইন্সপেক্টর দুবে, সুটকেস দুটো আপনার জিম্মায় রাখুন।
ইয়েস স্যর

একজন লোক ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল - ডাক্তার ঘটক
কি হয়েছে? এ কে?
অমরেশ রাহা। দাড়ি গোঁফ নেই তাই চিনতে পারছেন না।

দেখুন তো বেঁচে আছে কি না।

ঘটক পরীক্ষা করে বললেন
মারা গেছে।

তখনি ভিড়ের মধ্যে কেউ বলে উঠল
অ্যাঁ- অমরেশ রাহা মারা গেছে -! কি সব্বোনাশ! কি হয়েছিল?
ফটোগ্রাফার নকুলেশবাবু

আপনাদের গাড়িও এসে পড়েছে। এখন বলবার সময় নেই। ফিরে এসে সব শুনবেন।
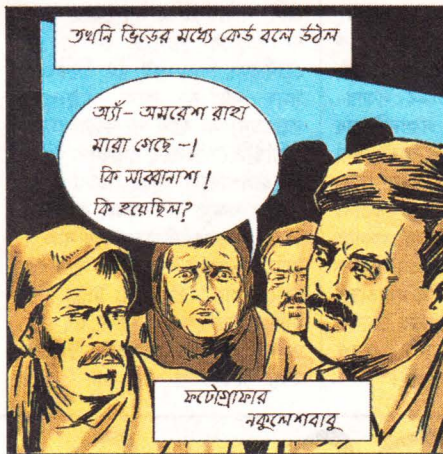
২রা জানুয়ারি। কলকাতায় ফিরছি। ডি এস পি পান্ডে, মহীধরবাবু ও রজনী এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেছেন।
একটা সাংঘাতিক ভুল করেছিলুম। অমরেশ রাহা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, তার যে পিস্তুল থাকতে পারে একথা মনেই আসেনি।
না, না। গোড়া থেকে বলো।

দুটো জিনিস জট পাকিয়ে গিয়েছিল। এক ছবি চুরি, দুই ডাক্তার আর রজনীর প্রণয়। তাতে নিন্দের কিছু ছিল না। ওরা কলকাতায় গিয়ে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করেছে।
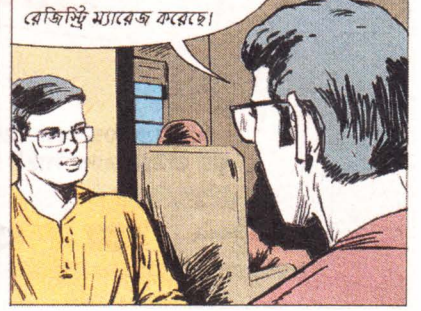
রজনীর মাসি আর মেসো ছাড়া এটা আর কেউ জানে না। যতদিন মহীধরবাবু থাকবেন তিনিও জানবেন না। তাঁর মনে আঘাত না লাগার জন্যই এই গোপনীয়তা।

এ খবরটা কি ডাক্তারের কাছে পেলে?

উঁহু। ডাক্তার কে ঘাঁটাই নি। ও যে রকম খেপে ছিল কিছু বলতে গেলেই কামড়ে দিত। আমি রজনীকে আড়ালে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে সব স্বীকার করে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমরা কি অন্যায় করছি? আমি ওদের আশীর্বাদ করেছি ওরা যেন সুখী হয়।

তারপর বলো।

ছবি চুরির ব্যাপারটাকে যদি হাল্কাভাবে নাও তাহলে তার অনেকরকম ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু যদি গুরুতর ব্যাপার মনে কর, তাহলে তার একটিমাত্র ব্যাখ্যা হয় –
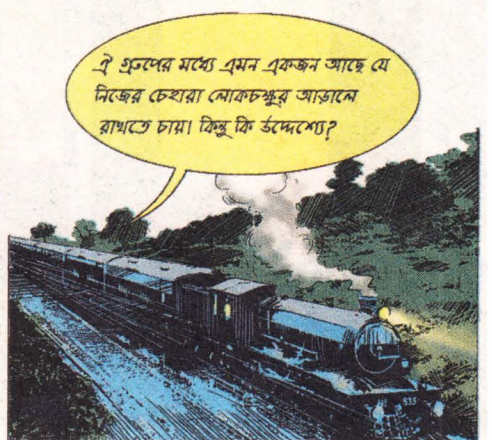
ঐ গ্রুপের মধ্যে এমন একজন আছে যে নিজের চেহারা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চায়। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে?

একটা হতে পারে যে ওই দলে কোনও একজন দাগী আসামী আছে যে নিজের ছবির প্রচার চায় না। কিন্তু এটা এক্ষেত্রে টেকসই নয়। এই ছবিতে যারা আছে তারা কেউ লুকিয়ে বেড়ায় না, তাদের সকলেই চেনে। সুতরাং তাদের ছবি চুরি করার কোনও মানে হয় না।

কিন্তু যদি এ দলে এমন কেউ থাকে যে ভবিষ্যতে কোনও অপরাধ করে কেটে পড়বার তালে আছে, তাহলে সে নিজের ছবি লোপাট করতে চাইবে।

অজিত, তুমি তো লেখক, শুধু ভাষার দ্বারা একটা লোকের এমন হুবহু বর্ণনা দিতে পার যাতে তাকে দেখলেই চেনা যায়?

এই রে – সেরকম বর্ণনা দেওয়া – মানে ওইভাবে –

পারবে না, বিশেষত তার চেহারা যদি মামুলি হয় তাহলে একেবারেই পারবে না। কিন্তু একটা ফটোগ্রাফ – মুহূর্তমধ্যে তার চেহারাখানা চোখের সামনে তুলে ধরতে পারে।

তাই দাগী আসামীদের ফটো পুলিসের ফাইলে রাখা থাকে। তাহলে এটাই দাঁড়ালো যে ঐ দলের একটা লোক অপরাধ করে ডুব মারবার ফন্দি আঁটছে।

এখন প্রশ্ন এই – সংকল্পিত অপরাধটা কি এবং লোকটা কে?

লোক গুলোকে এক এক করে ধরা যাক। মহীধরবাবু – করবেন না। বিপুল সম্পত্তি, চেহারাও বিপুল – সম্ভব নয়। ডাক্তার – রজনীকে নিয়ে উধাও হতে পারে কিন্তু সে সাবালিকা – আইন ঘটিত অপরাধ নয়। অধ্যাপক সোম কেও বাদ দিতে পারো। কারন সোমের আরও অন্য ছবি আছে।

নকুলেশবাবু মহীধর বাবুর থেকে মোটা টাকা ধার নিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষেও গা ঢাকা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তিনি নিজে ছবিটা তুলেছেন, ছবিতে তার থাকার কথা নয়। সুতরাং তাকেও বাদ দেওয়া গেল।

বাকি রয়ে গেলেন ডেপুটি উমানাথ বাবু আর ব্যাঙ্ক ম্যানেজার অমরেশ রাহা।

প্রথমে উমানাথ বাবুকে ধরো, স্ত্রী পুত্র আছে, চেহারাটা এমন ফোটো না থাকলেও সনাক্ত করা চলে। চোখে কালো চশমা, তার একটা চোখ কানা। পুলিসের চোখ এড়িয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাছাড়া সদাই যে লোক চাকরি যাবার ভয়ে শঙ্কিত, তার পক্ষে এমন একটা দুঃসাহসিক কাজ করা সম্ভব নয়।

এবার অমরেশ রাহা। খুবই সাধারন চেহারা। এমন দেখতে লক্ষ লক্ষ লোক চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। এই দাড়ির সুবিধে, কামিয়ে ফেললেই মুখ অনেক বদলে যায়। তখন চেনা লোক অচেনা মনে হয়।

নকল দাড়ি পরার চেয়ে তাই আসল দাড়ি কামিয়ে ফেলা বেশি নিরাপদ। অবিবাহিত, মাইনেতে সন্তুষ্ট নন। আলমারিতে গুজরাটী বই ছিল। চেষ্টা করে গুজরাটী শিখছিলেন। হয়তো ব্যাঙ্কের টাকা মেরে দিয়ে বোম্বাই অঞ্চলে গিয়ে বসার ইচ্ছা ছিল।

যাই হোক, অমরেশবাবু সবদিক ভেবে আটঘাট বেঁধে তৈরী হয়েছিলেন। কিন্তু যখন কাজে নামতে গেলেন তখন তার সামনে অপ্রত্যাশিত কতগুলো বাধা উপস্থিত হলো। পিকনিকের দলে গিয়ে তাকে ছবি তোলাতে হলো।

কিন্তু তার সবকিছু ওলোট পালোট করে দিলো ফালগুনী পাল। সে থাকতে ছবি চুরি করে লাভ কি? অমরেশ বাবুকে সে দেখেছে। পুলিস বললেই সে তো হুবহু এঁকে ফটোর অভাব পুরন করে দেবে।

সেই রাতে তিনি মদের বোতলে বেশ খানিকটা আফিম মিশিয়ে ফালগুনীর কুঁড়েতে গেলেন।
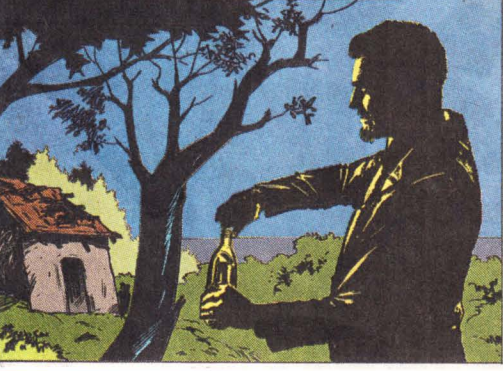
যা হোক, এভাবে অমরেশবাবু নিজেকে নিষ্কণ্টক করলেন। আমি যখন বুঝতে পারলাম এ অমরেশবাবুর কাজ, তখন পান্ডে সাহেবকে সব কথা বললাম। তিনি ভারি বুদ্ধিমান লোক।

সেই থেকে এক মিনিটের জন্য অমরেশবাবুকে চোখের আড়াল হতে দেননি।
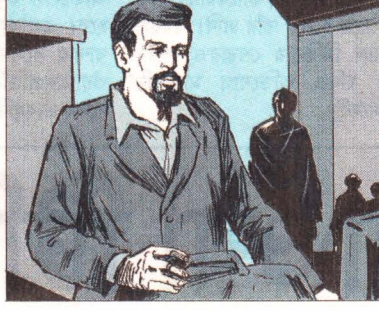
আচ্ছা, অমরেশ রাহা যে ঠিক ঐ দিনেই পালাবে, এটা বুঝলে কি করে? অন্য দিনেও তো সে পালাতে পারতো।

একটা কোনও ছুটির আগে পালানোর সুবিধে আছে। দুদিন সময় পাওয়া যায়। দুদিন পরে ব্যাঙ্ক খুললে যখন চুরি ধরা পড়বে, চোর তখন অনেক দূরে।

আর কোনো প্রশ্ন আছে?
দাড়ি সে কামালো কখন? ট্রেনে?
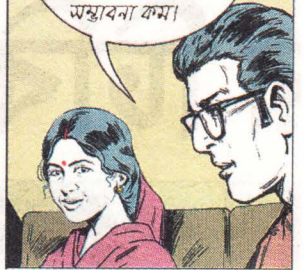
হ্যাঁ। সেইজন্যেই ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট কিনেছিল। সেখানে সহযাত্রীর সম্ভাবনা কম।

মহীধরবাবুকে বেনামী চিঠি দিয়েছিল কে?
প্রফেসর সোম। কিন্তু তার প্রতি অবিচার কোরো না। লোকটা শিক্ষিত, সজ্জন।

এক ভয়ঙ্করী স্ত্রীলোকের হাতে পড়ে তার জীবনটা নষ্ট হতে বসেছে। সংসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে রজনীর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

কিন্তু সেদিকেও কিছু হল না। ডাক্তার ঘটকের কাছে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গেলেন। তাই ঈর্ষার জ্বালায় তিনি বেনামী চিঠি দেন।

মালতী দেবীর অসুখের খুবই বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। কারো মৃত্যু কামনা করতে নেই, কিন্তু তিনি যদি এইবেলা সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে স্বর্গে যান তাহলে আমি মোটেই অসুখী হব না।
শেষ